গবেষণার সংক্ষিপ্তসার (Synopsis of Research)

বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তুলনামূলক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

গবেষক
বিমলেশ মান্না
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
ড. কনক চন্দ্র সরকার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৪

বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তুলনামূলক আলোচনা

ভূমিকা

ভারতবর্ষ তথা বাংলার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত। তারা অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরি ও কর্মসংস্থান এবং সামাজিক এক কথায় সার্বিক বিকাশের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে দলিত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মহান ব্যক্তিবর্গ তাদের সমাজের জন্য নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। এছাড়া স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী (২৬ শে জানুয়ারি ১৯৫০) হওয়ার পরে শিক্ষা, সরকারি চাকরি ও সংসদীয় নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলিত সমাজের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এতদসত্বেও দেখা যাচ্ছে যে দলিত সমাজের সবাই ওই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলো গ্রহণ করতে পারছে না। দলিত সমাজের একটি বৃহত্তম অংশের মানুষজন উপযুক্ত শিক্ষা এবং সামাজিক চেতনার অভাবে সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। এছাড়া সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতের দলিত সমাজের মানুষের প্রতি অদলিত মানুষজন ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং হেয় প্রতিপন্ন করেই চলেছে প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি। দলিত সমাজের এহেন দুর্দশার কারণ নির্ণয় প্রতিকার এবং সেই জন্য কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরী।

বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা হল ভারতীয় সভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চিন্তা চেতনা নিয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা ছিলনা, ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে জানতো না প্রভৃতি। এতদসত্বেও আধুনিক কালের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী (Nationalist) ও সাম্রাজ্যবাদী (Empirealist) ইতিহাস চর্চার ঘরানা কে চ্যালেঞ্জ করে দলিত স্টাডিজ (Dalit Studies) এবং সাবলটার্ন স্টাডিজের (Subaltern Studies) আগমন ঘটিয়েছেন। দলিত স্টাডিজে জাতপাত সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা করা হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতপাতের উদ্ভব প্রাচীনকালে হয়েছিল। কিন্তু আধুনিককালে যখন ইংরেজ জাতি ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল করেছিল সেই সময় থেকে নতুন ভাবে জাতপাতের ইতিহাস চর্চায় গতি সঞ্চার করেছিল কিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Bucanon Hamilton (১৭৬২-১৮২৯), William Wilson Hunter (১৮৪০-১৯০০), Herbert Hope Risley (১৮৫১-১৯১১) প্রমূখ। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৮৩) ভারতের প্রান্তিক সমাজের মানুষজন নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এছাড়া ১৯৯০ দশকের গোড়ায় দলিত প্রর্তকের (Dalit Discourse) সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত। ১৮৭২ সালে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয়। ফলে তখন থেকেই ভারতীয় সমাজে জাতি পরিচিতি নির্মাণের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত।

জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০), সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭), শ্রীনারায়ণ গুরু (১৮৫৬-১৯২৮), ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখদের দ্বারা ভারতে যেমন দলিত আন্দোলন গতি পেয়েছিল। ঠিক তেমনি তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সমাজ গঠনেও মনোনিবেশ করেছিলেন। বাংলা প্রদেশের দলিত জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলিও নিজেদের শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে তারা জাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া আলোচ্য সময়ে নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি উচ্চবর্ণীয়দের সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে উচ্চস্তরে ওঠার চেষ্টা করেন। যা সমাজবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিকরণ নামে অভিহিত হতে থাকে। এবং প্রাচীন ভারত থেকে প্রচলিত জাত ব্যবস্থার (Caste System) বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিম্নবর্ণীয় জাতিরা আন্দোলনে সামিল হতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences) বা ইতিহাস চর্চায় (Historical Studies) ওই সমস্ত নিম্নবর্ণীয় জাতিদের সংস্কার আন্দোলন গুলি অপাংতেয় হয়ে রয়েছে বা অনালোচিত থেকেছে বহুদিন। তাই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস এবং তিনটি দলিত জাতির তিনজন ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক এবং সংস্কার মুলক কার্যকলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা।

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাপত্রটি ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত পাঁচটি অধ্যায়ে রচিত।

ভূমিকা পর্বটিতে গবেষণার সমস্যার বিবরণ, গবেষণার পরিধি গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্য ও সাহিত্য সমীক্ষা, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি ও উপাদান এবং প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে প্রথমেই ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাত ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় জাতি ও বর্ণ যে সমার্থক শব্দ সে সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া ঋকবেদে প্রথম বর্ণভেদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, ভগবতগীতা প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বাখ্যা দেয়া হয়েছে সেগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীগণ যে তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেগুলি সম্পর্কেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান অধ্যায়ে দলিত বলতে কাদের বোঝানো হয় এবং ভারতবর্ষে কখন থেকে দলিত শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কার দ্বারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন অর্থে দলিত বলতে কি বোঝানো হয় সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এবং ঔপনিবেশিক বাংলার কিছু কিছু তপশিলি জাতিগুলির জেলাভিত্তিক বাসস্থান, তাদের জীবন জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। উপনিবেশিক পরবর্তীকালে বাংলার কোন কোন জাতিগুলি তপশিলি জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কিভাবে প্রবেশ করেছিল সে সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যদিও প্রথমে ঐ শিক্ষা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার উচ্চবর্ণীয় ও উচ্চবৃত্তের হস্ত গত ছিল। আলোচ্য পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা যৎসামান্য পরিমাণে নিম্নবর্ণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। আধুনিক ভারতে জাত ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন এবং নিম্নবর্নীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০) সবার প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিবা ফুলে জাতি ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে তাঁর আক্রমণের প্রধান বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। এবং ওইগুলির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী সঞ্চারও করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও আলোচিত হয়েছে। যেমন তাঁর অন্যতম রচনা সম্ভার- ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মনাঙ্গে কাসব" এতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদেরকে কিভাবে শোষণ করেছিল তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে "দীনবন্ধু" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে অস্পৃশ্য, শূদ্রদের অধিকার গুলিকে তুলে ধরেন। এবং তাঁর বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থটি হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "গুলামগিরি" সেখানেও প্রায় একই ধরনের ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের একাধিপত্যের কথাকে সমাজে তুলে ধরেছেন, এছাড়া "চাষীর চাবুক" গ্রন্থ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে নারী মুক্তির আন্দোলনে যে কয়েকজন মহিয়সী মহিলা অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে

(১৮৩১-১৮৯৩)। জ্যোতিবা ফুলের সাথে সঙ্গ দিয়েছিলেন তার স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে সে সম্পর্কেও আমরা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছি। সাবিত্রীবাঈ ফুলে মহারাষ্ট্রের নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়েছিল। তারপরেও তিনি কিভাবে আধুনিক ভারতের প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা হয়ে উঠেছিলেন সেই ইতিহাস সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তিনি প্রধানত নারী শিক্ষা সম্পর্কে জোর দিয়েছিলেন এবং কিছুটা সফল হয়েছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি শিক্ষাকে পাঠক্রমের মধ্যে বন্দী রাখেননি। মানুষ যাতে চরিত্রবান হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে সাবিত্রীবাঈ ফুলের অভিমতকেও তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের গতিসঞ্চার হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় সামাজিক সংস্কার ও মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিল এরাওয়ারা, যা পরবর্তী সময়ে সেখানকার কাম্মালার, চেরুমার, নায়াডির ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। এরাওয়ারা ছিল সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও অস্পৃশ্য শ্রেণীভূক্ত। দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য দলিতদের সংগ্রামের পুরোভাগের প্রধান কান্ডারী ছিলেন শ্রী নারায়ণ গুরু (১৮৫৫-১৯২৮)। যেমন কেরালাতে শ্রী নারায়ণ গুরু দলিতদেরকে কিভাবে আত্মচেতনার বিকাশে বলীয়ান করে তুলেছিল তারও বিবরণ আলোচ্য গবেষণাপত্রে রচিত হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩) ভারতের দরিদ্র নিপীড়িত, অস্পৃশ্য ও শূদ্রদের জন্য সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তামিল শুদ্রদের উন্নতিকল্পে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতিকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ১৯২৫ সালে

কংগ্রেস ত্যাগ করে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলনে যোগদান করে দলিত আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে স্থান দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে।

পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রে বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং দলিত আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলেছিল সে সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আম্বেদকর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার সমাজে এবং সাংগঠনিক অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মানবিক অধিকার অর্জন এবং আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আম্বেদকর ভারতের অস্পৃশ্য, শূদ্র দলিতদের মানসিক দাসত্বের বন্ধন ও জাতব্যবস্থার শৃংখল থেকে মুক্তির জন্য যেসব আদর্শের কথা বলেছিলেন তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক বাংলায় দলিতদের আত্মচেতনার উন্মেষে যে সমস্ত দলিত মনীষীরা অবদান রেখেছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে যেমন নমঃশূদ্র সমাজের হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮)। বাংলার দলিত জাতিগুলি তথা নমঃশূদ্র বা মতুয়াদের মধ্যে মুক্তির নবজাগরণে হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদান সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। তিনিই প্রথম বলেন সাংসারিক বন্ধনে থেকেও ব্যাক্তির মুক্তি কিভাবে সম্ভব তা পথ নির্দেশ করেছেন সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে আলোচ্য গবেষণা সন্ধর্ভে। হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া দের কে যে বারটি পালনীয় বিধির কথা বলেছিলেন এগুলি সম্পর্কেও এখানে আলোচনা রয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য

পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭) বাংলার দলিত আন্দোলনের পথকে কিভাবে চালিত করেছিল সে সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনার করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হলেন মহাত্মা রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২)। সমকালীন সময়ে তিনি নিজে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বাংলার সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন। কারন তিনি সমাজের উচ্চবর্ণীয়দের কাছ থেকে যেমন অসংখ্যবার মানসিক ভাবে প্রত্যক্ষ আঘাত অনুভব করেছিলেন। ঠিক একই ভাবে তিনি নিজের সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছ থেকেও একাধিক বার কিভাবে মানসিক ব্যাথা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনার করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে। পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে রাইচরণ যে সব গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পৌণ্ড্র সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলোর প্রসার ঘটানো। শিক্ষা প্রসারে যুক্ত অপর একটি অঙ্গ হল হোস্টেল বা ছাত্রাবাস। তাঁর সমকালীন ছাত্রাবাসের যে চরম সংকট সেই ভাবনা থেকেই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন সে সম্পর্কেও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তথা বাংলাতে যে নবজাগরণ ও আত্মচেতন বোধ শুরু হয়েছিল তার প্রধান এবং প্রথম মানদণ্ড ছিল বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর শিক্ষা বিস্তার তাই তিনি অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেই সম্পর্কে অবদান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার পৌণ্ড্র সমাজের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হল তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার

জন্য দ্বাদশাহ অশৌচ পালন, উপনয়ন বা উপবীত ধারন ইত্যাদি আচরন বিধি গ্রহন করা। ঐ সংস্কার মূলক আন্দোলন গুলিতে রাইচরণ সরদারের অবদান কতখানি সেই বিষয় সম্পর্কে গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রাইচরণ সরদারকে কেন বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক বলা হয় সে সম্পর্কেও বিশেষভাবে উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তিনি ছিলেন বাংলার তপশিলি জাতির প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা। তার আত্মজীবনীর নাম হল "দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা"। ওই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি সম্পর্কে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাইচরণ সরদারের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল "শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র" এই গ্রন্থে তিনি পৌন্ড্রদের ক্ষত্রিত্ব প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন সে সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুগে যুগে শত শত দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ ও মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, তার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লেখা রয়েছে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮)। তিনি নমঃশূদ্র সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় একাধিক বার তিনি কিভাবে জাত ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন, দলিত জাতিদের জন্য প্রভুত জনকল্যান মূলক কাজ করেছিলেন যেমন আইন পাশ করার পর থেকে ভারতীয় সমাজে নিপীড়িত, অবহেলিত, দলিত

মানুষের কল্যানে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বরিশাল আদালতে বিনা অর্থে নিম্নবর্ণীয় মানুষদের আইনি সমস্যার কাজ করতেন। তরুণ তুর্কি MLA যোগেন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রধান কাজ হল ব্যপক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। সেই জন্য তিনি বিধান সভার অধিবেসনে রাজনীতির দাবী গুলির থেকে শিক্ষার দাবীকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। যোগেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টাতে বরিশাল জেলাতে অসংখ্য উচ্চ ইংরেজি, মধ্য ইংরেজি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় সেগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত এবং তথ্য মূলক ভাবে আলোচিত হয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ 'বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। 'জাগরণ' পত্রিকা ছিল 'বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশনের' প্রধান মুখপত্র। তৎকালীন সময়ে বাংলা প্রদেশের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের মধ্যে সার্বিক চেতনার অভাব ছিল। সেই চেতনার অভাবকে তিনি কিভাবে পূরন করেছিলেন সে বিষয়েও আলোচিত হয়েছে আলচ্য অধ্যায়ে। এছাড়া যখন সংবিধান সভাতে বা গণপরিষদে আম্বেদকরের প্রবেশ অসম্ভব যোগেন্দ্রনাথ সেই মুহুর্তে নিজে কিভাবে সেই জায়গায় আম্বেদকরকে গণপরিষদে প্রেরন করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গবেষণাপত্রে।

এছাড়া বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ দায়ী ছিল কি? সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচিত হয়েছে। তিনি কিভাবে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মালো সমাজের উল্লেখযোগ্য দলিত লেখক হলেন শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)। অদ্বৈত তাঁর এই স্বল্পময় জীবনে খুবই মানবিক প্রকৃতির ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের সে সম্পূর্ন আলাদা ঘরানার যে লেখক তা আমরা তার উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে ভালোভাবে উপলব্ধী করতে পেরেছি ঐতিহাসিক আলোচনার প্রেক্ষিতে। এছাড়া অদ্বৈত যে জন্য খ্যাতির শীর্ষে তার সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিনি কিভাবে অশিক্ষিত দরিদ্র মালো সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন কাহিনীর ইতিহাসকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল তা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। অদ্বৈত তাঁর কবিতা, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধে নিম্নবর্ণের বা নিম্নবর্গীয়দের দারিদ্রের পাশাপাশি জাত-ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট অস্পৃশ্যতাকেও সমান ভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপকে চিত্রিত করেছেন। যেমন 'বরজের গান' নিবন্ধে, ‘ত্রিপুর লক্ষ্মী' কবিতা, 'আশালতার মৃত্যু' গল্পে। এবং 'ভাই ফোঁটার গান' নিবন্ধে বাংলার সমগ্র হিন্দুদের এক মিলন মুখর উৎসব 'ভাইফোঁটা' উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলার মেয়েরা যে সমস্ত গান বাঁধে তাকেও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বিবিধ লেখায় সমকালীন মালো সমাজের করুণ সমাজ চিত্রের বিবরণ ও আর্থিক দুর্বলতার বিষয়টিকে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অদ্বৈত তার লেখাতে শুধুমাত্র দলিত মালোদের জীবন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের নিদারুণ জীবন যন্ত্রণার ইতিহাসকেও তার রচনায় স্থান দিয়েছেন সে

সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। অদ্বৈত ছিলেন ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্য লেখক। এছাড়া তিনি দলিত নিম্নবর্ণীয় এবং নিম্নবর্গীয়দের জীবন বোধের চেতনার ইতিহাসকেও আলোচনা করেছেন। বহু ক্ষেত্রে দলিত সমাজের হয়েও উচ্চ বর্ণীয়দের প্রশ্নের প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন সেগুলিও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অদ্বৈতের লিখিত রচনার মধ্যে শুধু স্থানীয় মালোদের ইতিহাস রচিত হয়নি, তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। যেমন তার ভারতের চিঠি পাল বাক্যে গ্রন্থটিতে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর কাহিনী তুলে ধরেছেন তারও বর্ণানা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা সন্ধর্ভে।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণা পত্রের জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক এবং সহায়ক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলিকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষক নিজস্ব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা উপসংহারে আলোচিত হল। বর্তমান গবেষণা পত্রটির প্রধান বিষয়বস্তু হল অবিভক্ত বাংলার তিনজন দলিত ব্যক্তিত্বের উপর তুলনা মূলক রচিত। দলিত শব্দটি আধুনিক মারাঠি শব্দ। বর্তমান গবেষণাপত্র থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাত ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ফলে ভারতীয় সমাজ বহুধা বিভক্ত সমাজে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ শাসনাধীনে যখন ১৮৭২ সালে প্রথম

জনগণনার সূচনা হল তখন থেকে আবার জাতি পরিচিতি নির্মাণও শুরু হয়েছিল। যেটা বৈদিক সমাজে চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্র হিসেবে বর্ণিত তাদেরই বৃহৎ অংশ আধুনিক ভারতে SC, ST, OBC হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এবং আম্বেদকরের চেতনায় তাঁরা দলিত হিসাবে পরিচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলাতে আমরা ৭৬ টি তপশিলি জাতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এবং তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতি সম্পর্কে অবিভক্ত বাংলায় তাদের জেলা ভিত্তিক বাসস্থান, জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে সমক্য ধারনা অর্জন করতে পেরেছি।

তুলনা মূলক আলোচনার মাধম্যে বর্তমান গবেষণাপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পৌন্ড্র সমাজের রাইচরণ সরদার ছিলেন পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট একজন আইনজীবী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বিবিধ সংস্কার মূলক কাজের মাধ্যমে তার সমাজকে জাগরিত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। তিনি সর্বদা নিম্নবর্ণীয় দলিতদের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এবং নিম্নবর্ণীয়দের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বি. আর. আম্বেদকরকে সংবিধান সভাতে পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে দলিত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন নিম্নবর্ণীয় মালো সমাজের। তিনি প্রাচীন ভারত থেকে প্রচলিত জাত ব্যবস্থা কিভাবে আধুনিক ভারতীয় সামাজিক অবস্থাকে কলুষিত করেছিল তা তিনি তাঁর বিবিধ রচনায় সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে

জানতে পারছি যে তিনটি সম্প্রদায়ের তিনজন ব্যক্তি তিনটি ক্ষেত্রের সাহায্যে তাদের সমাজকে জাগরিত করছে এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার দিশা দেখাচ্ছে।

05/09/24

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Bimalesh Manna
05/09/24

গবেষকের স্বাক্ষর